ইবসেনের নোরা ও রবীন্দ্রনাথের মৃণাল : নারীমুক্তির যুগলগাথা

পম্পা মজুমদার*

[সারসংক্ষেপ : আবহমানকাল ধরে চলে আসা পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অন্তরাত্মা গুমরে মরেছে। বিশেষ করে সপ্তদশ অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক অনুশাসন লঙ্ঘন করে স্বাধীনভাবে বাঁচার কথা নারী কল্পনাও করতে পারত না। একদিকে সামাজিক শৃঙ্খলের বেড়ি অন্যদিকে অন্তরাত্মার আর্তনাদে বিপর্যস্ত নারীজীবন মহৎপ্রাণকে পীড়িত করেছে। সাহিত্য সমাজের দর্পণ। তাই সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে সাহিত্যিকরা সমাজের যাবতীয় অনাচার-বৈষম্য-অনুশাসনকে বিভিন্নভাবে সাহিত্যে রূপদান করে থাকেন। কিন্তু সামাজিক অনুশাসনের সঙ্গে সংঘর্ষপূর্ণ এমন কোনো বিষয়কে সাহিত্যে রূপদান করার সাহস সকলেরই থাকে না। সেই সাহস দেখাতে পেরেছিলেন বিশ্বসাহিত্যের প্রবাদপ্রতিম দু'জন ব্যক্তিত্ব হেনরিক ইবসেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নিষ্পেষিত নারীর অন্তর্বেদনাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাঁরা। তাই সামাজিক অনুশাসন এর বেড়ি ভেঙে নির্মাণ করতে পেরেছিলেন সাহসী, প্রতিবাদী ও নির্ভীক নারী চরিত্র। ইবসেন এবং রবীন্দ্রনাথের একাধিক রচনায় নারী-জীবনের শোষণ-বঞ্চনার চিত্র যেমন উঠে এসেছে তেমনি পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ভাস্বর এমন চরিত্রের সংখ্যাও কম নয়। মূলত তাঁরা সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে নারীর মুক্তির পথ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় মুক্তির বার্তা বহন করে নরওয়েজীয় নাট্যসাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন নোরা। তেমনি রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে বাংলা সাহিত্য পেল মৃণালকে। এই চরিত্রদ্বয় শৃঙ্খলিত নারীকে দিলেন উত্তরণের দিশা। সেই আলোকরেখা ধরে আজও হেঁটে চলেছে হাজার-হাজার মেয়েরা। নোরা ও মৃণালকে অনুসরণ করে তারা পেয়েছে নারী থেকে মানুষ হওয়ার মন্ত্রণা। মূলত দুটি ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় নোরা এবং মৃণালের জন্ম হলেও কোথাও যেন তাদের একটা যোগসূত্র রয়েছে। সেই যোগসূত্র অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে কীভাবে তারা নারীমুক্তির প্রতীকে পরিণত হলেন সেই বিষয়টি তুলে ধরাই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।]

দেশে-দেশে কালে-কালে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে নারীর জীবনের মানদণ্ড নিরূপিত হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে। স্থান-কাল-দেশ ভেদে নারীর সামাজিক অবস্থানের প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল– কখনো সে কন্যা, কখনো বোন, কখনো স্ত্রী, কখনো সে মা। বিশ্বব্যাপী ভিন্ন ভিন্ন সমাজবাস্তবতায় দুয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া নারী বরাবরই পুরুষ প্রদর্শিত সে পথেই হেঁটেছে। কিন্তু স্ত্রী-কন্যা-মা এই পরিচয় তথা পারিবারিক গণ্ডির বাইরেও নারীর যে একটি নিজস্ব জীবন রয়েছে সেই জীবনের হদিস নারী বহুকাল পায়নি। নারীরা জানেনি তাদের নিজস্ব সত্তা রয়েছে, মানুষ হিসেবে সমাজে নিজস্বতাকে প্রতিষ্ঠিত করার অধিকার রয়েছে। নারীর সেই আচরণ ছিল অনেকটা চাবি দেওয়া পুতুলের মত, যে পুতুল চিরকালই শেখানো বুলি বলে যায়। নারীর এই অবস্থান থেকে নারীকে মুক্ত করার জন্যই নারীবাদ শব্দটির সূত্রপাত। আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষ নারীবাদ শব্দটিকে একটু বাঁকা চোখে দেখেন। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীবাদ শব্দটিকে পুরুষবিরোধী মনোভাব হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। কিন্তু আদতে নারীবাদ পুরুষবিরোধী কোনো তত্ত্ব নয়, বরং "নারীর পশ্চাৎপদতা, নারীর অধিকারহীনতা,

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

তার বঞ্চনার কারণ অন্বেষণ করা ও সেগুলো মোচন করার পন্থা বের করা নারীবাদের উদ্দেশ্য।" (হাবিব, ২০১৭ : ৩৭৮) নারী-পুরুষের বৈষম্য আমাদের সমাজব্যবস্থায় একটি দীর্ঘকালীন এবং অপেক্ষাকৃত জটিল একটি সমস্যা। শুধু ভারতীয় উপমহাদেশ নয় সমগ্র বিশ্বব্যাপী এই সমস্যা একসময় মহামারীর রূপ ধারণ করেছিল। মূলত এই সমস্যার মূলে ছিল পুরুষতন্ত্র। পুরুষ বরাবরই নারীর তুলনায় দৈহিক কিংবা বৌদ্ধিক দিক থেকে নিজেকে মহৎ বিবেচনা করে এসেছে। নারীও দীর্ঘকাল ধরে কোনো বিবেচনা ছাড়াই পুরুষের চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় সিদ্ধান্তকে সত্য বলে জেনে এসেছে। ফলশ্রুতিতে নারী-পুরুষের মধ্যে সৃষ্ট এই বিভাজন রেখা সমাজে ক্যান্সারের মত জেঁকে বসেছিল। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের ভাষ্য :

> প্রতিদিনের সাদামাঠা জীবনের জগৎ থেকে জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করলে আমরা দেখি যে এ জগতে পুরুষকে মানুষ আবিষ্কার করছে বৌদ্ধিক সত্তা হিসেবে। এ জগতে নারীকে অবৌদ্ধিক সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পুরুষসত্তা যুক্তি-বুদ্ধির চেতনায় আলোকিত কিন্তু নারীসত্তা যুক্তি-বুদ্ধিহীন আবেগের তাড়নায় বশীভূত। এভাবেই পুরুষসত্তা ও নারীসত্তার মাঝে বিভেদের বৈষম্য তৈরি করা হয়েছে। যুগে যুগে এ মতের উপর ভিত্তি করেই নারীসত্তাকে গুণগত দিক দিয়ে নিম্নস্তরের সত্তা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। নারী নিজেও এভাবেই নিজেকে জেনেছে এবং নিজ সত্তা সম্বন্ধে উদাসীন থেকেছে। নারীর ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণগুলো গড়ে উঠতে সবসময় বাধা পেয়েছে একদিকে সমাজ থেকে, অন্যদিকে নিজের কাছ থেকেই। (হাবিব, ২০১৭ : ৩৭৮)

সহজ ভাষায় বলতে গেলে নারীবাদ হচ্ছে সমাজসৃষ্ট সকল প্রকার বৈষম্য থেকে নারীর বেরিয়ে আসার গল্প। নারী ও পুরুষ– এই লৈঙ্গিক পরিচয়ের বাইরের সত্য সকলেই মানুষ। কিন্তু এই সহজ সত্যটিকে ভুলে আমরা প্রতিনিয়ত বিভাজনের দেওয়াল গড়ে তুলি। নারীবাদ প্রসঙ্গে হুমায়ুন আজাদ বলেছেন :

> নারীপুরুষ সমান, তাদের অধিকার অভিন্ন : এ হচ্ছে নারীবাদ। একে মনে হয় সরল, দিবালোকের মতো স্বচ্ছ, সত্য বলে; কিন্তু পিতৃতন্ত্রের দীর্ঘ ইতিহাসে মানা হয়নি এ-সরল সত্যটুকু। নারীবাদীরা মনে করেন মৌল যোগ্যতায় কোনো পার্থক্য নেই নরনারীতে; নারী ও পুরুষের মূল পরিচয় তাদের স্ত্রী বা পুংলিঙ্গ নয়, তাদের মূল পরিচয় তারা মানুষ। (হাবিব, ২০১৭ : ৩৭১)

এই নারীবাদ শব্দটি শৈল্পিক অভিধা লাভ করার বহু পূর্বেই নারীর সামাজিক অবস্থান, নারীর মর্যাদা এবং অধিকার নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন বিশ্বসাহিত্যের কিংবদন্তীতুল্য দুই লেখক হেনরিক ইবসেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কোনো তত্ত্ব কিংবা মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয় বরং ব্যক্তিগত উপলব্ধি এবং বোধের জায়গা থেকে তাঁরা সৃষ্টি করেছেন নোরা এবং মৃণালের ন্যায় নারী চরিত্র। ইবসেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান যোজন যোজন হওয়া সত্ত্বেও ঠিক একই সময়ে বসে তাদের নারী সম্পর্কিত ভাবনা ছিল অভিন্ন। "নারী সম্পর্কিত ভাবনায় ইবসেন ও রবীন্দ্রনাথ মনে হয় প্রায় এক সমতলে দাঁড়িয়েছেন" (তরুণ, ২০১৫ : ৪৪)।

ইবসেন ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে যখন 'এ ডলস হাউজ' নাটকের নোরাকে পুরুষতন্ত্রের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন; ঠিক সেই সময়েই তরুণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে নারীমুক্তির পক্ষে লেখনী ধারণ করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাস-কবিতা-নাটকে সৃষ্ট নারীদের নিজেদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলেন। রবীন্দ্র-সৃষ্ট এরকমই একটি নারী চরিত্র 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণাল। ইবসেনের নোরা এবং রবীন্দ্রনাথের মৃণালের মুক্তির পথ স্বতন্ত্র হলেও এই দুই নারীই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন

করে নারী পরিচয়ের ঊর্ধ্বে মানুষ হিসেবে নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠ করতে চেয়েছে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে নোরা এবং মৃণাল পুরুষশাসিত সমাজবাস্তবতায় নারীমুক্তির দিশারীস্বরূপ। বলা চলে এই চরিত্রদ্বয় অনেকাংশে নারীবাদীদের পথ দেখিয়েছে এবং এরই সূত্র ধরে পরবর্তীকালে নারীবাদী আন্দোলন জোরদার হয়েছে।

২.

নোরা চরিত্রের স্রষ্টা হেনরিক ইবসেন বিশ্বসাহিত্যের একজন প্রবাদপ্রতিম নাট্যকার। ইবসেনের পুরো নাম হেনরিক যোহান ইবসেন (১৮২০-১৯০৬)। ইবসেনের হাত ধরে সমকালীন সাহিত্যে বাস্তববাদী নাট্যধারার সূত্রপাত ঘটে। নাটকের মধ্য দিয়ে ইবসেন সমাজবদলের গান গেয়েছেন। সমকালীন ভিক্টোরীয় নীতি ও আদর্শের উপর দাঁড়িয়ে থাকা নাট্যসাহিত্যকে ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দিয়ে তিনি সমাজের গলিত রূপটাকে নাটকে তুলে এনেছেন। তার নাটকের প্রধান উপজীব্য সমাজের নানা অসংগতি, অনাচার, বৈষম্য ও পুরুষতন্ত্রের যূপকাষ্ঠে নিষ্পেষিত নারীদের বঞ্চনা, যন্ত্রণা ও সংগ্রামের চিত্র। ইবসেনের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সেলিনা হোসেন বলেছেন :

> দুটো মৌল সত্য ইবসেন স্পষ্ট করে উচ্চারণ করেছিলেন তার সমকালের মানুষের সামনে। তিনি স্বাধীনতা বলতে বুঝতেন ব্যক্তির সর্বোচ্চ মুক্তি। বলতেন, মানুষের মন থেকে দাস-মনোভাব, আনুগত্যের প্রবণতা, কুসংস্কার, কুপমণ্ডূকতা দূর করা উচিত। তাহলেই ব্যক্তি তার নিজ স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে জীবন যাপন করতে পারবে। এই স্বাধীনতার স্বপ্ন তিনি দেখেছেন নারী পুরুষের জীবনে। (সেলিনা, ২০০৬ : ভূমিকা)

ইবসেনের খ্যাতির অন্যতম রসদ তাঁর সৃষ্টি নারী চরিত্র। মূলত লেখার মধ্য দিয়ে ইবসেন নারীর ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছেন। "ইবসেনের নাটকের নারী চরিত্রগুলো আমাদের বারবার এবং পুনরায় ভাবতে বাধ্য করে। তার নারী চরিত্রগুলো ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় আমাদের সামনে হাজির হয় যা পুরুষকেন্দ্রিক চরিত্রগুলোকে দ্বিধাবিভক্ত করে দেয়।" (সেলিনা হোসেন, ২০০৬ : ৪২৮) ইবসেনের একটি কালজয়ী সৃষ্টিকর্ম 'এ ডলস হাউস নাটক'টি (১৮৭৯)। এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নোরা কালের গণ্ডি পেরিয়ে হয়ে উঠেছে কালোত্তীর্ণ। প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে রচিত এই নাটকটি আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। নোরা চরিত্রের মধ্য দিয়ে ইবসেন সমকালীন সমাজে নারীর অবস্থানকে যেমন চিহ্নিত করেছেন তেমনি নোরা চরিত্রের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে নারীর মুক্তির পথ বাতলে দিয়েছেন। মূলত 'এ ডলস হাউস' নামকরণের মধ্যেই ইবসনের অভীপ্সার ইঙ্গিত রয়েছে অর্থাৎ সমকালীন সমাজে নারীর ভূমিকা ছিল পুতুলের মতো। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী পুতুলের মতো আচরণ করেছে– তার নিজের কোনো ইচ্ছা নেই স্বাধীনতা নেই বরং স্বামী নামক যন্ত্রের মনোরঞ্জন করাই যেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু নাটকের শেষে সেই পুতুলের সংসারকে গুঁড়িয়ে দিয়ে নাট্যকার ইবসেন প্রাণহীন সেই পুতুলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইবসেনের এই উদ্যোগ সমকালে সত্যিকার অর্থেই সাহসী পদক্ষেপ। প্রাণহীন পুতুলের প্রাণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি নারীকে নতুন জীবনের দিশা দিয়েছেন। সমালোচকের ভাষ্যে :

> নাটকের তৃতীয় অঙ্কে মুহূর্তের মধ্যে নোরার চরিত্র মহীয়সী হয়ে ওঠে, তার যন্ত্রণার সাগরে শুচিত হয়ে সে তুলে ধরে গ্রীবা যেন শতাব্দী চেয়ে উঁচু। নিজের সত্য অবস্থান ও অস্তিত্বকে আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এক নতুন নোরার জন্ম হয়। (সেলিনা, ২০০৬ : ১৩৫)

তিন অঙ্কবিশিষ্ট 'এ ডলস হাউস' নাটকের মধ্য দিয়ে ইবসেন আমাদের দেখিয়েছেন একজন নারী পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় কখনোই স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। কারণ এই সমাজে পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়। তাই ইবসেন সচেতনভাবেই নোরার মধ্য দিয়ে নারী-জীবনের এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন। নাটকের প্রথম দুই অঙ্কে নোরা গতানুগতিক আর পাঁচটা সাধারণ গৃহবধূর ন্যায়। স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য সে যাবতীয় কাজ করতে প্রস্তুত। কিন্তু ইবসেন যেন নাটকের শেষ অঙ্কটি লেখার জন্যই নোরাকে সৃষ্টি করেছেন। দীর্ঘদিনের সংসার জীবনে নোরা একটা সময় উপলব্ধি করেছে সে শুধুমাত্র স্বামীর ভোগের সামগ্রী। তার এতদিনের সংসার মূলত একটা পুতুলের সংসার। স্বামীকে সে মনেপ্রাণে ভালবাসলেও স্বামীর কাছে সে শুধুমাত্র সম্ভোগের উপকরণ। এই সত্যটি উপলব্ধি করে নোরা আত্ম-আবিষ্কারের বাসনায় ঘর ছেড়েছে। উপলব্ধি করেছে কন্যা, স্ত্রী, মা এইসব পরিচয়ের ঊর্ধ্বে তাঁর আরও একটি পরিচয় আছে। উপলব্ধি করেছে সবার আগে সে একজন মানুষ। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক মুম রহমান বলেন :

> এই নাটকেই প্রথম দাম্পত্য জীবনের পাতানো খেলার ফাঁক ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরুষশাসিত সমাজের সাথে নারী ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ তুলে ধরা হয়েছে সুচারুভাবে। এই নাটকেই প্রথম নারী ব্যক্তিত্বের উন্মেষ, নারীর আত্মোপলব্ধি, নারীর প্রতিবাদ এবং সর্বোপরি ব্যক্তি মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নারীর প্রতি তথাকথিত করুণা-মায়াকে নাট্যকার তীব্রভাবে কষাঘাত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ক্ষুদ্র গৃহকোণে অবস্থান করে সংসার করাই নারীর একমাত্র কর্ম নয়। ...পুরুষ সাজানো এই সংসারের বিরুদ্ধে নোরার নারীসত্তার বিদ্রোহ–আত্মোপলব্ধি এবং নারী ব্যক্তিত্বের বিকাশই এ নাটকের প্রধান উপজীব্য। (মুম, ২০১৩ : দৈনিক ইত্তেফাক)

'এ ডলস হাউস' নাটকের নাট্য কাহিনিতে দেখা যায় নোরা এক বুর্জোয়া গৃহবধূ। সে স্বামীর আদরিণী স্ত্রী, মমতাময়ী মা। স্বামী হেলমার তাকে আদর করে কখনো গানের পাখি কখনো কাঠবিড়ালি বিভিন্ন শিশুসুলভ নামে ডাকে। স্বামী ও সন্তানের প্রতি কর্তব্যে তার কোনো ত্রুটি নেই। স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য চলতে থাকে তার নানা আয়োজন। কখনো গৃহসজ্জা কখনো নাচের মধ্য দিয়ে স্বামীর মন জয় করতে চায় সে। অন্যদিকে হেলমার চরিত্রেও নোরার প্রতি কর্তৃত্বপরায়ণ একটা মনোভাব লক্ষণীয়। নোরা যেন তার কাছে একটা পোষা পাখি। যে পাখি পুষতে হেলমারকে বেশ খরচ করতে হয়। বেশ দিব্যি চলছিল নোরার সংসার। হঠাৎ করে নোরা চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কিছু অর্থ ধার করাকে কেন্দ্র করে। একবার হেলমারের অসুস্থতার সময় নোরা হেলমারকে লুকিয়ে বেশকিছু অর্থ ধার করে। হেলমারকে সুস্থ করতে তখন হাওয়াবদল জরুরি হয়ে ওঠে। ঠিক সেই মুহূর্তে হেলমারের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ ছিল না। ফলে হেলমারকে লুকিয়ে নোরা মোটা অঙ্কের কিছু টাকা ধার করে। নোরা হেলমারের কাছে বিষয়টি গোপন করতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত ক্রোগস্ট্যাড নামক এক যুবকের মাধ্যমে ঘটনাটি জানতে পারে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বেশ বাকবিতণ্ডা হয়। স্বামীর জীবন রক্ষার জন্য ক্রোগস্ট্যাডের সঙ্গে জালিয়াতি করে নোরা অর্থ ধার করে সেটাই তার অপরাধ। সে প্রশ্ন করে 'স্বামীর জীবন রক্ষার অধিকার কি স্ত্রীর নেই?' নোরা উপলব্ধি করে এই সংসারে সে একেবারেই মূল্যহীন, একটা সাজানো পুতুল মাত্র। নোরার ভাষ্যে :

> তুমি সবসময় আমার প্রতি অনেক দয়া দেখিয়েছো। আসলে আমাদের বাড়িটা খেলাঘর ছাড়া আর কিছু নয়। আগে আমি ছিলাম বাবার পুতুল শিশু আর এখানে হয়েছি তোমার পুতুল স্ত্রী।

> আর একইভাবে আমার সন্তানগুলো আমার হাতের পুতুল যখন তুমি এসে আমার সাথে খেলতে আমি মজা পেতাম একইভাবে আমি যখন আমার বাচ্চাদের সাথে খেলি তারা মজা পায়। আমাদের বিয়েটা নিছক পুতুল–খেলা ব্যতীত কিছু নয়। (তুহিন, ২০১৯ : ১০৫)

সমকালীন সমাজে স্বামীর সিদ্ধান্তের বাইরে স্ত্রীর সিদ্ধান্ত নেওয়া একটা মারাত্মক অপরাধ হিসেবে গণ্য হতো। স্বাধীনভাবে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তার নেই। স্বামীর জীবন বাঁচাতে অর্থ ধার করলে শেষ পর্যন্ত স্বামীর কাছেই হেনস্তা হতে হয়েছে নোরাকে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নোরা উপলব্ধি করেছে একসময় তার পিতার মতই ছিল তার মত এবং বিবাহের পর স্বামীর সিদ্ধান্তই তার সিদ্ধান্তে পরিণত হয়েছে। এর বাইরে মত প্রকাশের কোনো স্বাধীনতা নেই। নোরার অন্তরালে নাট্যকার সেই অপ্রিয় সত্যকে তুলে ধরেছেন এভাবে :

> আমি যখন বাড়িতে বাবার সাথে থাকতাম তিনি বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে তার মতামত আমাকে জানাতেন এবং আমি সে গুলোকে নিজের মতামত হিসেবে ধারণ করতাম। আমি অন্য ধরনের অভিমত শুনতে পেলেও সেগুলোর কথা কদাচিৎ মুখে আনতাম না কারণ আমার বাবা হয়তো সব পছন্দ করতেন না। তিনি আমাকে পুতুল কন্যা নামে সম্বোধন করতেন। আমি যখন নিজের পুতুলগুলো নিয়ে খেলতাম তখন বাবা আমার সাথে খেলতেন। তারপর আমি তোমার বাড়িতে বাস করতে এলাম ...আমি বলছি যে হাতবদল হয়ে আমি বাবার অধীন থেকে তোমার অধীনে এসেছিলাম। তোমার রুচি ও অভিরুচি মতো তুমি সংসারের পুরো ছকটা সাজিয়েছো আর আমিও তোমার চাহিদা অনুযায়ী চলেছি অথবা চলার ভান করেছি। আমি নিজেই জানি না এর কোনটা আমি করেছিলাম। হয়তো দুটোই কখনো প্রথমটা আবার অন্য কোন সময় দ্বিতীয়টা। যখন আমি পিছু ফিরে আবার অতীতের দিকে তাকাই আমার মনে হয় আমি এখানে কোন মতে খেয়ে পরে ভিক্ষুকের মতো জীবন কাটাচ্ছি। এতদিন তোমাকে নানা ছলাকলা দেখিয়ে দিন কাটিয়েছি। টোরভাল্ড তুমি অবশ্যই এমনটাই চেয়েছিলে। বাবা আর তুমি মিলে আমার প্রতি চরম অন্যায় করেছ। আমার জীবনটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার দায় তোমার। (তুহিন, ২০১৯ : ১০৪–১০৫)

নোরা তার এই করুণ পরিণতির জন্য পিতা এবং স্বামীকে দায়ী করেছে। মূলত এই পিতা এবং স্বামী দু'জনেই পুরুষতন্ত্রের প্রতীক। নোরার মধ্য দিয়ে ইবসেন যেন পুরুষতন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করে দিতে চাইলেন। তাই নোরা নিজের এই পুতুল ভূমিকাকে উপলব্ধি করে সংসার ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। সে উপলব্ধি করে এ সমাজ-সংসারে তার নিজের একটা পরিচয় রয়েছে। তাই আত্ম-আবিষ্কারের তাগিদে সাজানো-গোছানো সংসার ছেড়ে নোরা অনিশ্চিত পৃথিবীর পথে পা বাড়ায়। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য :

> পৃথিবীর নাট্য ইতিহাসে এই প্রথম একজন নারী তার নিজের সাজানো সংসার ছেড়ে প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাঁড়ায় স্বেচ্ছায়, সচেতনভাবে। পেছনে তার নিজের হাতে বন্ধ করা নিজের ঘরের দরজা সামনে তার অচেনা অবাধ পৃথিবী। তবুও তার এই আত্মোপলব্ধি, নারী ব্যক্তিত্বের উন্মেষ, পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে তার সংঘর্ষ, তাকে 'নোরা'কে আলাদা মানুষ হিসেবে বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা করে। নোরা হয়ে ওঠে নারী মুক্তির বিশ্বপ্রতীক। (মুম, ২০১৩)

নোরার সজোরে দরজা বন্ধ করে গৃহ ত্যাগের যে চিত্র নাট্যকার নির্মাণ করলেন এর মধ্য দিয়েই নারী পুরুষতন্ত্রের খোলস থেকে মুক্ত হলো। সজোরে দরজা বন্ধের এই শব্দ মূলত পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে নারীর ক্ষোভ ও ঘৃণার প্রতীক। একইসঙ্গে এই শব্দের মধ্য দিয়ে খুলে গেল নারীমুক্তির দুয়ার।

৩.

বাংলা সাহিত্যে বিচিত্র সব নারী চরিত্রের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মৃণাল রবীন্দ্রসৃষ্ট অনবদ্য এক নারী চরিত্র। রবীন্দ্রনাথের অধিক সমাদৃত ছোটোগল্প 'স্ত্রীর পত্র'র নায়িকা মৃণাল। ব্যক্তিত্বের মহিমায় চরিত্রের দৃঢ়তায় মৃণাল রবীন্দ্রনাথের এক দুর্লভ সৃষ্টি। সামসময়িক সমাজবাস্তবতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেন অনেকটা সচেতনভাবেই মৃণালকে সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সময়ে প্রতিনিয়ত পুরুষতন্ত্রের যূপকাষ্ঠে নারীর বলিদান হয়েছে। সমাজে নারী-পুরুষের সামাজিক বৈষম্য রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছে বারংবার। সমাজের এই বৈষম্য, পুরুষের দাসত্ব থেকে নারীকে মুক্ত করার অদম্য ইচ্ছা থেকেই রবীন্দ্র মানসে জন্ম নেয় মৃণাল। নারীর হেন করুণ দশা বরাবরই রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছে। এজন্য রবীন্দ্রনাথ আজীবন তার লেখনীর মধ্য দিয়ে নারী মুক্তির পথ অন্বেষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য :

> যখন যেমন পরিস্থিতি তার জন্য তিনি প্রস্তুত। তিনি আমাদের ঘুম-ভাঙানিয়া, তিনি আমাদের দুঃখ-জাগানিয়া। কিন্তু আজ বহুদিন পরে তার মৃণালিনীর চিঠি আবার পড়তে গিয়ে ভেবেছি এত সহজে কয়েকটি পাতার মধ্যে মানুষটি মৃণাল হয়ে এমন এক ক্ষয়িষ্ণু বিবেকহীন সমাজের ছবি আঁকলেন যা কিনা কোন সহজ করুণাময়ী নাটক নয় বরং আঁধারে আবদ্ধ পরিবেশকে বহু উঁচুর আলো থেকে বর্ণনা করার প্রয়াস। তাই এই লেখাটি পড়তে গিয়ে করুণ রসে হোঁচট না খেয়ে একটি বুদ্ধিমান মানুষের (মৃণালের) হাত ধরে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে চিনে নেওয়া যাবে। (দীপেন, ২০১৪)

'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি উত্তম পুরুষে লেখা এক সাধারণ বাঙালি গৃহবধূর যাবতীয় শোষণ-বঞ্চনা ও প্রতিবাদের দলিল। রবীন্দ্রনাথের মৃণাল পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বাস্তবতার যাবতীয় গরলকে উগরে দিয়েছে একটি চিঠির মধ্য দিয়ে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় বিদ্রোহকে ধারণ করে আছে চরিত্রটি। সংসারের যাঁতাকলে পিষ্ট মৃণাল একসময় সংসার ত্যাগ করে। সমাজ ও সংসারের গৎবাঁধা নিয়মকে তোয়াক্কা না করেই নিজের মুক্তির পথ খুঁজে নিয়েছে। মৃণালের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি অন্তঃসারশূন্য সমাজব্যবস্থার কঙ্কালকে উন্মোচন করেছেন। মৃণালের চিঠি সেই অন্তঃসারশূন্য সমাজব্যবস্থা থেকে বাঙালি নারীর মুক্তির বাহক। নারী-স্বাধীনতার স্বপক্ষে সৃষ্ট এমন নারী চরিত্র বাংলা সাহিত্যে বিরল। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য :

> মৃণালের চিঠি কোন নিগৃহীতা নারীর আক্ষেপ নয়, বরং এক শক্তিশালী নারী মুক্তির বাণী। মৃণাল পুরী থেকে চিঠি লিখছেন তার স্বামীকে– সেই চিঠি আত্মজীবনীর নিচে যে অঙ্গার সেই অঙ্গারের উন্মুক্ত আলোর কাহিনী। এই চিঠিতে স্বামীর নাম অনুল্লেখিত। এই চিঠি যেন লেখা সমস্ত পুরুষ সমাজের প্রতি। (দীপেন, ২০১৪)

রবীন্দ্রনাথের মৃণাল অজপাড়াগাঁয়ের সাধারণ একটি মেয়ে। কলকাতার সাতাশ নম্বর মাখন বড়াল গলির একটি বাড়িতে মেজবউ হয়ে গল্পে তার আত্মপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন সমাজে নারীর রূপের কদর থাকলেও সমাজের অন্তঃপুরে নারীর গুণের কদর ছিল না। ফলে সমাজের বাইরের দিকটায় জৌলুস আর চাকচিক্য থাকলেও সমাজের অন্তঃপুরের চিত্রটা ছিল গোয়াল ঘরের মতোই শ্রীহীন। তাই মৃণালের অন্তরালে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জানান :

> সদরে তোমাদের একটুখানি বাগান আছে। ঘরের সাজসজ্জা-আসবাবের অভাব নেই। আর অন্দরটা যেন পশমের কাজের উল্টো পিঠ; সেদিকে কোনো লজ্জা নেই, শ্রী নেই, সজ্জা নেই। সে দিকে আলো মিটমিট করে জ্বলে; হাওয়া চোরের মত প্রবেশ করে; উঠোনের আবর্জনা নড়তে

> চায় না; দেয়ালের এবং মেঝের সমস্ত কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে। ... আত্মসম্মান যখন কমে যায় তখন অনাদরকে তো অন্যায্য বলে মনে হয় না। সেইজন্যে তার বেদনা নেই। তাই তো মেয়েমানুষ দুঃখবোধ করতেই লজ্জা পায়। আমি তাই বলি মেয়ে মানুষকে দুঃখ পেতে হবে এটা যদি তোমাদের ব্যবস্থা হয় তাহলে যতদূর সম্ভব তাকে অনাদরে রেখে দেওয়াই ভালো; আদরে দুঃখের ব্যথাটা কেবল বেড়ে ওঠে। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ২৬৮)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃণালকে শুধু রূপ দেননি দিয়েছিলেন আত্মসম্মানবোধ ও বুদ্ধিমত্তা। কিন্তু মৃণালের সমকালীন সমাজে নারী বুদ্ধিমত্তা যেন অভিশাপস্বরূপ। তাই রূপের কদর পেলেও অতিরিক্ত বুদ্ধিমত্তার জন্য মৃণালকে পদে পদে হোঁচট খেতে হয়েছে। মৃণালের ভাষ্যে :

> আমার রূপ আছে সে কথা ভুলতে তোমার বেশিদিন লাগে নি। কিন্তু, আমার যে বুদ্ধি আছে সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ করতে হয়েছে। ওই বুদ্ধিটা আমার এত স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকন্নার মধ্যে এতকাল কাটিয়েও আজও সে টিকে আছে। ... যাকে বাধা মেনে চলতে হবে, সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চলতে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাঙ্গবেই। কিন্তু, কি করব বলো। তোমাদের ঘরের বউয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, সে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকে। তোমরা আমাকে মেয়ে-জ্যাঠা বলে দুবেলা গাল দিয়েছ। কটু কথাই হচ্ছে অক্ষমের সান্ত্বনা; অতএব সে আমি ক্ষমা করলুম। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ২৬৭)

জৌলুসহীন সেই অন্তঃপুরে মৃণাল নিজের সবটুকু নিয়ে নিজের মতো করে বাঁচতে চেয়েছে। কখনো অবলা পশুর প্রতি অপত্য স্নেহে কখনো বা কবিতা লিখে দিব্যি চলে যাচ্ছিল মৃণালের সময়টুকু। সমাজ-সংসারের কটাক্ষকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যখন দিব্যি তার জীবন কাটছিল সেই মুহূর্তে নতুন করে তাকে বিষাদ্গ্রস্ত করে তোলে সন্তান হারানোর বেদনা।

> আমার মেয়েটি জন্ম নিয়েই মারা গেল। আমাকেও সে সঙ্গে যাবার সময় ডাক দিয়েছিল। সে যদি বেঁচে থাকত তা হলে সেই আমার জীবনে যা-কিছু বড়ো, যা-কিছু সত্য, সমস্ত এনে দিত; তখন মেজোবউ থেকে একেবারে মা হয়ে বসতুম। মা যে এক সংসারের মধ্য থেকেও বিশ্ব-সংসারের। মা হবার দুঃখটুকু পেলুম; কিন্তু মা হবার মুক্তিটুকু পেলুম না। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ২৬৮)

মৃণালের সেই অস্তগামী জীবনে হঠাৎ আলোর রেখার মতো উদয় হলো বিন্দু। বিন্দু তার বড়ো জায়ের ছোটো বোন। বলা চলে বিন্দু নামক এই চরিত্রই সংসারে নারীর অবস্থান সম্পর্কে মৃণালকে স্পষ্ট ধারণা দিয়েছে—

> আমার মেয়েটি তো সন্ধ্যাতারার মতো ক্ষণকালের জন্য উদয় হয়ে অস্ত গেল। আবার আমার নিত্যকর্ম এবং গরু-বাছুর নিয়ে পড়লুম। জীবন তেমনি করেই গড়াতে গড়াতে শেষ পর্যন্ত কেটে যেত; আজকে তোমাকে এই চিঠি লেখবার দরকারই হতো না। কিন্তু, বাতাসে সামান্য একটা বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালান এর মধ্যে অশথ গাছের অঙ্কুর বের করে; শেষকালে সেইটুকু থেকে ইটকাঠের বুকের পাঁজর বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমার সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে ছোটো একটুখানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল; তারপর থেকে ফাটল শুরু হল। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ২৬৮–২৬৯)

অসহায় ও নিরাশ্রয় বিন্দুকে মৃণাল প্রাণপণে আগলে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু বিন্দুর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তার অমতে এক পাগলের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করে। মৃণাল বারবার প্রতিবাদ জানালেও শেষ রক্ষা হয়নি। সমাজের নানা অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে বিন্দু আত্মহত্যা করে। বিন্দুর সেই নির্মম পরিণতি মৃণালের মধ্যে নতুন বোধের সঞ্চার করে।

সংসারে নারীর করুণ অবস্থানটি তাকে পীড়িত করে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও সংসারের এই বন্দিদশা মৃণালের কাছে অসহ্য মনে হয়। তাই মৃণাল স্পষ্ট চিত্তে স্বামীকে জানিয়ে দেয় :

> তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করি নে। আমার সমুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ। তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিল। ক্ষণকালের জন্য বিন্দু এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে ডেকে নিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়ে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখবার জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ যাঁর চোখে ভালো লেগেছে সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখছেন। এইবার মরেছে মেজোবউ। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ২৭৮)

বিন্দুর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুক্ত হলো মৃণাল। সংসারের বন্দীদশা থেকে মুক্ত হতে মৃণাল চলে যায় তীর্থক্ষেত্রে। কিন্তু বিন্দুর মতো আত্মহত্যার পথে হাঁটেনি বরং চেয়েছে স্বাধীনভাবে বাঁচতে। মীরাবাঈ-এর জীবন থেকে অনুপ্রাণিত মৃণাল স্পষ্টভাবে স্বামীকে জানিয়ে দেয় সে আর সংসারে ফিরবে না।

> তুমি ভাবছো আমি মরতে যাচ্ছি– ভয় নেই অমন পুরোনো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। মীরাবাঈও তো আমার মতো মেয়েমানুষ ছিল– তার শিকলও তো কম ভারী ছিল না, তাকে তো বাঁচবার জন্য মরতে হয় নি। মীরাবাঈ তার গানে বলেছিল, 'ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল, প্রভু– তাতে তার যা হবার তা হোক।
> এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা।
> আমিও বাঁচব। আমিও বাঁচলুম। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ২৭৮)

রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বড়ো চমক রেখেছেন গল্পের শেষে। মৃণালের সমকালে বাঙালি নারী সংসার ত্যাগের কথা চিন্তাই করতে পারত না। সেখানে রবীন্দ্রনাথের মৃণাল শুধু সংসার ত্যাগ করেই ক্ষান্ত হয়নি একইসঙ্গে পুরুষতন্ত্রের যাবতীয় অনাচার ও বৈষম্য থেকে নিজেকে মুক্ত করতে উচ্চারণ করেছে– 'তোমাদের চরণতলাশ্রয় ছিন্ন মৃণাল' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ২৭৮)। মৃণালের এই উচ্চারণ যেন পুরুষতন্ত্রের গালে চপেটাঘাত। স্বামীর চরণ আশ্রয় ছিন্নের মধ্য দিয়ে মৃণাল যেন সমকালীন সমাজে নারীর মুক্তির পথ বাতলে দিলেন। রবীন্দ্রনাথের মৃণাল সময় থেকে অগ্রসরবর্তী চরিত্র। যে সময় বাঙালি নারীর জন্য বরাদ্দ ছিল রান্নাঘর সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের মৃণাল কবিতা লিখেছে। মূলত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃণালের মধ্য দিয়ে তার কাঙ্ক্ষিত বাঙালি নারী চরিত্র অঙ্কন করেছিলেন কারণ সমকালীন সমাজবাস্তবতায় মৃণালিনী চরিত্র দুর্লভ। মৃণাল সমকালের আর পাঁচটা সাধারণ বাঙালি গৃহবধূ নয়। ঘরকন্যার বাইরেও নারীর একটা নিজস্ব সত্তা রয়েছে। সেই সত্তাকে অনুসন্ধানের তীব্র স্পৃহা মৃণাল চরিত্রে লক্ষণীয়। মৃণালের এই আমি সত্তা তাকে করেছে অনন্য :

> আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জান নি আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাঁশ যাই হোক-না, সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠে নি। সেইখানে আমার মুক্তি; সেইখানে আমি আমি। আমার মধ্যে যা-কিছু তোমাদের মেজোবউকে ছাড়িয়ে রয়েছে সে তোমরা পছন্দ কর নি, চিনতেও পার নি; আমি যে কবি সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়ে নি। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ২৬৭)

মৃণাল যেন রবীন্দ্রনাথের কাঙ্ক্ষিত সেই মানস কন্যা যে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সজোরে চপেটাঘাত করতে পেরেছে। এই রকম সাহসী, নির্ভীক, প্রতিবাদী ও ব্যক্তিসচেতন বাঙালি নারী চরিত্র সমকালীন বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ।

৪.

ইবসেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান যোজন-যোজন হওয়া সত্ত্বেও ইবসেন ও রবীন্দ্রনাথের নারী সম্পর্কিত চিন্তাধারা অভিন্ন। কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইবসেন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মৃণালের ন্যায় চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে নোরা ও মৃণালের পটভূমি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইবসেনের নোরা এক স্বাধীন দেশের বুর্জোয়া নারী অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের মৃণাল পরাধীন দেশের সাধারণ গৃহবধূ। ফলে ইবসেন যেখানে নোরাকে আত্ম-আবিষ্কারের প্রশ্নে সম্পূর্ণ মুক্ত পৃথিবীর পথে ছেড়ে দিতে পেরেছেন, রবীন্দ্রনাথ পারেননি। রবীন্দ্রনাথের মৃণাল সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে ঠিকই কিন্তু পাঠক অনুমান করতে পারে মৃণালের আশ্রয় হবে কোনো তীর্থক্ষেত্র। অন্যদিকে ইবসেনের নোরার সম্মুখে পুরো পৃথিবীটাই উন্মুক্ত। এক পরাধীন দেশের নারীকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুরোপুরিভাবে মুক্ত করতে পারেননি। কিন্তু নোরা এবং মৃণাল দুজনই দুই ভিন্ন সমাজবাস্তবতায় দাঁড়িয়ে আত্ম-আবিষ্কারের প্রশ্নে এক বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। মৃণাল যেমন সমাজ ও সংসারের সকল বেড়াজালকে অতিক্রম করে উচ্চারণ করেছে, "আজ পনের বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধ আছে।" (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ২৬৬)

তেমনি নোরার কণ্ঠে উচ্চারিত হতে শুনি :

> আমার অনুরূপ আরও পবিত্র দায়িত্ব রয়েছে... আমার নিজের প্রতি কর্তব্য। ...আমি বিশ্বাস করি সবকিছুর আগে আমি একজন মানুষ ঠিক তুমি যেমন একজন মানুষ। আমি ভাবি আমার একজন সত্যিকারের মানুষ হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। (তুহিন, ২০১৯ : ১০৭)

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত নারীর মুক্তি সম্ভব নয়। এই সত্যটি ইবসেন এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। নারী অর্থনৈতিকভাবে পরাধীন থাকায় স্বামী নামক শাসকের অধীনস্থ হয়েছে যুগে যুগে। নোরা এবং মৃণাল দুই চরিত্রে এই বিষয়টি লক্ষণীয়। অতিরিক্ত খরচ করার জন্য নোরাকে যেমন স্বামীর কটূক্তি সহ্য করতে হয়েছে তেমনি হাত খরচের জন্য মৃণালকেও স্বামীর উপর নির্ভর করতে হয়। ইবসেন এবং রবীন্দ্রনাথ দু'জনই নোরা এবং মৃণাল চরিত্রের মধ্য দিয়ে অন্তঃসারশূন্য দাম্পত্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় দাম্পত্য জীবন যেন একটি সাজানো খেলাঘর। পুরুষ সেখানে খেলোয়াড় এবং নারী খেলার সামগ্রী। ফলে নারী পুরুষের বা স্বামী-স্ত্রীর মানসিক দূরত্ব সেখানে যোজন যোজন। দীর্ঘদিনের দাম্পত্য জীবন যে কতটা নিরর্থক নোরা এবং মৃণাল দুজনের উচ্চারণে তা স্পষ্ট হয়। নোরার সাহসী উচ্চারণে আমরা জানতে পারি দীর্ঘদিনের দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কোনো আলোচনা হয়নি এমন দাম্পত্য যেন পুতুল খেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ :

> আট বছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে তোমার কি চোখে পড়েনি যে এই প্রথম তুমি আর আমি স্বামী-স্ত্রী হিসেবে কোন বিষয় নিয়ে গুরুত্বসহকারে কথা বলছি ...গত আট বছর যাবত এবং তার চেয়েও বেশি সময় ধরে অর্থাৎ সেই যখন আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমরা কখনো গম্ভীর ভাবে কোনো গুরুতর বিষয় নিয়ে একটি কথাও বলিনি। (তুহিন, ২০১৯ : ১০৩)

নোরার সাহসী উচ্চারণ প্রসঙ্গে সমালোচক মন্তব্য করেন :

> বিশ্বসাহিত্যে দ্বিতীয় এমন কোন নাটক নেই যেখানে এরকমভাবে স্বামীর ভণ্ডামি কূপমণ্ডূকতা, অহংবোধ স্বামীকে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া, কাজের জগত থেকে নারীকে বাইরে রাখা কিংবা নারী কেন অধঃস্তন হয়ে পড়ে সে সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। (মাসুদুজ্জামান, ২০১৩)

দাম্পত্য জীবনের সেই ফাঁকি একইভাবে মৃণাল যেন ধরিয়ে দিলেন সাহসী উচ্চারণের মধ্য দিয়ে :

> আজ পনেরো বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে, আজ পর্যন্ত তোমাকে চিঠি লিখি নি। চিরদিন কাছেই পড়ে আছি– মুখের কথা অনেক শুনেছ, আমিও শুনেছি, চিঠি লেখবার মতো ফাঁকটুকু পাওয়া যায় নি।
>
> আজ আমি এসেছি তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে, তুমি আছ তোমার আপিসের কাজে। শামুকের সঙ্গে খোলসের যে সম্বন্ধ কলকাতার সঙ্গে তোমার তাই, সে তোমার দেহ-মনের সঙ্গে এঁটে গিয়েছে। তাই তুমি আপিসে ছুটির দরখাস্ত করলে না। বিধাতার তাই অভিপ্রায় ছিল; তিনি আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০১৬ : ২৬৬)

পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী পুরুষের অধস্তন। সমাজের সব আইন-কানুন পুরুষের তৈরি এই সত্যটি ইবসেন এবং রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সমালোচকের ভাষ্যে :

> নারীকে বিচার করা হয় পুরুষের বিবেক-বিবেচনার মানদণ্ড দিয়ে। সমাজের দুই ধরনের ভূমিকা ও দুই ধরনের বিচার নির্দিষ্ট থাকে ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য যাতে পক্ষপাতিত্ব থাকে ছেলেদের দিকে সামাজিক আচার অন্ধ অনুকরণ একটা কঠিন বন্দিশালায় মানুষকে নিক্ষেপ করে এবং তার মুক্তির চেতনাকে অনবরত বাধাগ্রস্ত করতে থাকে যতক্ষণ না সে নিজেই সকল শৃংখল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারে সবচেয়ে প্রচন্ডভাবে বাধাগ্রস্ত হয় নারী, নোরার যেমনটি হয়েছে। (সেলিনা, ২০০৬ : ১৩২)

তাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অন্তরাত্মা যখন গুমরে মরছে তখনই ইবসেন নাট্য মঞ্চে নিয়ে এলেন নোরাকে। পাশ্চাত্যের সেই পরাধীন নারী জীবনে মুক্তির বার্তা নিয়ে মঞ্চ কাপালেন নোরা। পাশ্চাত্যের এই নারীমুক্তির ঢেউ প্রাচ্যে এসেছে বেশ কিছু পরে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তরুণ বয়স থেকেই নারীর প্রতি সশ্রদ্ধ ও প্রীতিপূর্ণ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। অতঃপর বাঙালি নারীকে পুরুষতন্ত্রের শৃঙ্খল ছিন্ন করার মন্ত্রে উজ্জীবিত করতে সৃষ্টি করলেন মৃণালকে। আত্ম-আবিষ্কারের নেশায় মৃণাল এবং নোরা দুজনেই ঘরে না ফেরার সিদ্ধান্তে অবিচল। তাই নোরা কিংবা মৃণাল শুধুমাত্র নাটক কিংবা গল্পের প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি দেশ-কালের গণ্ডি অতিক্রম করে আজও তারা শৃঙ্খলিত নারীদের আলোর দিশা দিয়ে যাচ্ছে।

৫.

ইবসেনের নোরা কিংবা রবীন্দ্রনাথের মৃণালের আবেদন আজও শেষ হয়ে যায়নি। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আজও নারীরা একইভাবে পুরুষতন্ত্রের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছে। আজও আমাদের সমাজব্যবস্থায় নারী-পুরুষের মধ্যে এক বিরাট বিভাজনরেখা বিদ্যমান। নারী-পুরুষের পারস্পরিক সহযোগিতা ব্যতীত এই বিভাজন রেখা দূর হওয়া অসম্ভব। নারীকে যেমন তার অধিকার আদায়ে সচেতন হতে হবে ঠিক তেমনি পুরুষদেরও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা পরিহার করে উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নারীর সহযোদ্ধা হতে হবে। নারীরমুক্তির ক্ষেত্রে পুরুষকে সমান অংশীদার হতে হবে নইলে সমাজ পরিবর্তিত হবে না। তবু আজও মৃণাল কিংবা নোরা

নারীদের প্রতিবাদী হতে শেখায়, আত্মসচেতন হতে শেখায়। নোরা এবং মৃণালের পথ ধরে সমগ্র বিশ্বের নারীরা ক্রমান্বয়ে অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হচ্ছে, আত্ম-আবিষ্কারের নেশায় ছুটে চলেছে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। তাই রবীন্দ্রনাথের মৃণাল কিংবা ইবসেনের নোরা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

সহায়কপঞ্জি

তরুণ মুখোপাধ্যায় (২০১৫)। *নাট্যকার ইবসেন*। তুহিনা প্রকাশনী, কলকাতা।

তুহিন কুমার মুখোপাধ্যায় (২০১৯)। *পুতুলের সংসার* ('এ ডলস হাউসে'র বাংলা অনুবাদ)। দি বুক সেন্টার।

দীপেন ভট্টাচার্য (২০১৪)। 'পাঠ প্রতিক্রিয়া : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "স্ত্রীর পত্র"'। *গল্পপাঠ* (কার্তিক সংখ্যা– ১৪২১)।

মাসুদুজ্জামান (২০১৩)। 'নোরা : একটি নারীবাদী কবিতা'। আর্টস (সাহিত্য সাময়িকী)। বিডিনিউজ ২৪ ডট কম।

মুম রহমান (২০১৩)। 'ইবসেনের নোরা : নারীমুক্তির বিশ্ব প্রতীক'। দৈনিক ইত্তেফাক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১৬)। *ভাষাপ্রকাশ নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প*। ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা।

সেলিনা হোসেন (২০০৬)। *ইবসেনের নারী*। অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।

সেলিনা হোসেন (২০০৬)। *ইবসেনের নাটক ও কবিতা*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

হাবিব আর রহমান (২০১৭)। *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব : ধ্রুপদী ও আধুনিক*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।